অধ্যায় ৬

মানব শারীরতত্ত্ব : বর্জ্য ও নিষ্কাশন
Human Physiology : Wastes & Elimination

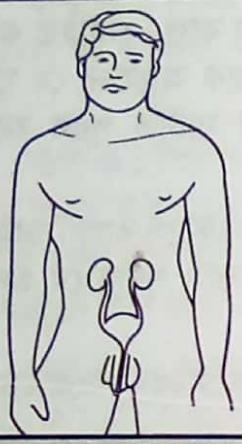

প্রধান শব্দাবলি (Key words)
- ☐ বৃক্ক
- ☐ নেফ্রন
- ☐ অসমোরেগুলেশন
- ☐ মূত্র
- ☐ ডায়ালাইসিস

অপচিতিমূলক বিপাক (catabolic metabolism) এর ফলে দেহে যেসব নাইট্রোজেনঘটিত দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলোকে **রেচন পদার্থ** বলে। যে প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেনঘটিত দূষিত পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয় তাকে **রেচন** (excretion) বলে এবং যে তন্ত্রের মাধ্যমে এসব বর্জ্য দেহ থেকে অপসারিত হয় তাকে বলা হয় **রেচন/ ইউরিনারি/রেনাল** (excretory/urinary/renal system)। মানুষের প্রধান রেচন পদার্থগুলো হ অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ইউরোক্রোম ইত্যাদি এবং প্রধান রেচন অঙ্গ হলো বৃ এ অধ্যায়ে বৃক্কের গঠন, কাজ ও এর জটিলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পিরিয়ড সংখ্যা–৬ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বৃক্কের গঠন ও কাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।	● বৃক্ক ○ গঠন ও কাজ
২. রেচনের শারীরবৃত্ত ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● রেচনের শারীরবৃত্ত
৩. মানব শরীরে রেচন ও অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের কার্যক্রমের যথার্থতা মূল্যায়ন করতে পারবে।	● বৃক্কের ভূমিকা ○ রেচন ○ অসমোরেগুলেশন
৪. বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের লক্ষণ ও ঐ মুহূর্তে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল, লক্ষণ ও করণীয়
৫. রক্ত ও মূত্রে হরমোনের ক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● হরমোনাল ক্রিয়া ○ মূত্রের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ ○ রক্তের পিএইচ নিয়ন্ত্রণ
৬. ব্যবহারিক : বৃক্কের অনুচ্ছেদ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।	● **ব্যবহারিক** ● বৃক্কের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ

রেচন পদার্থ নিষ্কাশনের জন্য মানবদেহে একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট তন্ত্র রয়েছে যা **রেচনতন্ত্র** নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে শতকরা ৮০ ভাগ রেচন পদার্থ নিষ্কাশিত হয়। বাকি ২০ ভাগ রেচন পদার্থ বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে উৎপন্ন ও বিভিন্ন অঙ্গ মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। এসব অঙ্গ সহকারী রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

মানুষের রেচনতন্ত্র (Human Excretory System)

মানুষের রেচনতন্ত্র –একজোড়া **বৃক্ক**, একজোড়া **ইউরেটার** বা **গবিনী**, একটি **মূত্রথলি** ও একটি **মূত্রনালি** নিয়ে গঠিত।

১. বৃক্ক (Kidney) : মানুষের উদর গহ্বরের কটি অঞ্চল (lumber region) মেরুদণ্ডের উভয় পাশে একটি করে মোট দুটি বৃক্ক থাকে। বৃক্কের উপরের প্রান্ত দ্বাদশ থোরাসিক কশেরুকার নিচে এবং নিচের প্রান্ত তৃতীয় লাম্বার কশেরুকার উপরে অবস্থিত। উদর গহ্বরে যকৃতের অবস্থানের কারণে বাম বৃক্কটি ডান বৃক্কের তুলনায় কিছুটা উপরে অবস্থিত। বৃক্ক দুটি দেখতে অনেকটা শিম বীজের মতো।

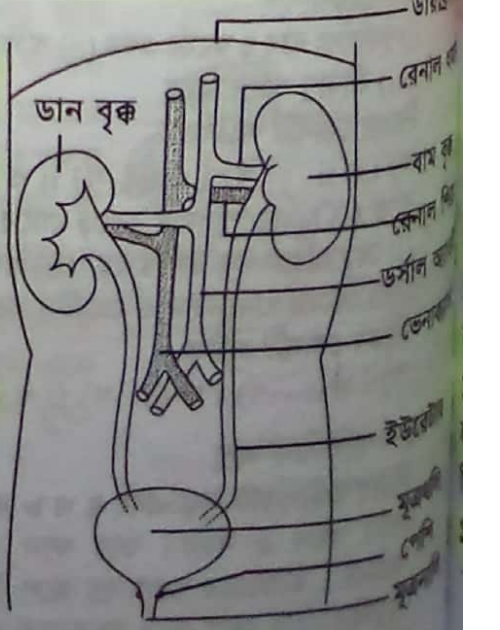

চিত্র ৬.১ : মানুষের রেচনতন্ত্র

২. রেচন নালি বা **ইউরেটার** (Ureter) : বৃক্কের পেলভিস থেকে সৃষ্টি হয়ে পৃষ্ঠউদরীয় প্রাচীর ঘেসে পশ্চাৎভাগে অগ্রসর হয়ে যে নালি মূত্রথলিতে উন্মুক্ত হয়েছে তাকে ইউরেটর বলে। প্রত্যেকটি নালি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার। এ নালি বৃক্ক থেকে মূত্রথলিতে মূত্র পরিবহন করে।

৩. মূত্রথলি (Urinary bladder) : মূত্রথলি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত একটি ত্রিকোণাকার থলি বিশেষ। এটি সংকোচন প্রসারণক্ষম। মূত্রথলি ৭০০-৭৫০ মিলিলিটার মূত্র ধারণ করতে পারে। তবে ২৮০-৩২০ মিলিলিটার মূত্র মূত্রথলিতে জমা হলেই ত্যাগের ইচ্ছা জাগে। মূত্র সাময়িকভাবে ধারণ করা ও সময়ে সময়ে মূত্র নিষ্কাশন করা এর কাজ।

৪. **মূত্রনালি** বা **ইউরেথ্রা** (Urethra) : পুরুষের ক্ষেত্রে মূত্রথলির পশ্চাৎপ্রান্ত থেকে মূত্রনালি উৎপন্ন হয়ে লিঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষে এই নালির দৈর্ঘ্য ১৮–১৯ সেন্টিমিটার। স্ত্রীলোকের মূত্রনালি একটি পৃথক ছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে উন্মুক্ত এবং এর দৈর্ঘ্য ৩.৫–৪ সেন্টিমিটার। মূত্র দেহের বাইরে নিষ্কাশন করা এর প্রধান কাজ। তাছাড়া পুরুষের ইউরেথ্রার মাধ্যমে বীর্য দেহের বাইরে নির্গত হয়।

বৃক্কের গঠন ও কাজ

বাহ্যিক গঠন : প্রতিটি বৃক্ক নিরেট, চাপা দেখতে অনেকটা শিম বীজের মতো এবং লালচে খয়েরী রংয়ের। একটি পরিণত বৃক্কের দৈর্ঘ্য ১০–১২ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৫–৬ সেন্টিমিটার এবং স্থূলত্ব ৩ সেন্টিমিটার। প্রত্যেকটির ওজন পুরুষে ১৫০–১৭০ গ্রাম এবং নারীদেহে ১৩০–১৫০ গ্রাম। বৃক্কের বাইরের দিক উত্তল ও ভিতরের দিক অবতল। অবতল অংশের ভাঁজকে **হাইলাম** (hilum) বা **হাইলাস** (hilus) বলে। এই হাইলামের মধ্য দিয়ে ইউরেটার ও রেনাল শিরা বহির্গত হয় এবং রেনাল ধমনি ও স্নায়ু বৃক্কে প্রবেশ করে। সমগ্র বৃক্ক **ক্যাপসুল** (capsule) নামক তন্তুময় যোজক টিস্যুর সুদৃঢ় আবরণে বেষ্টিত।

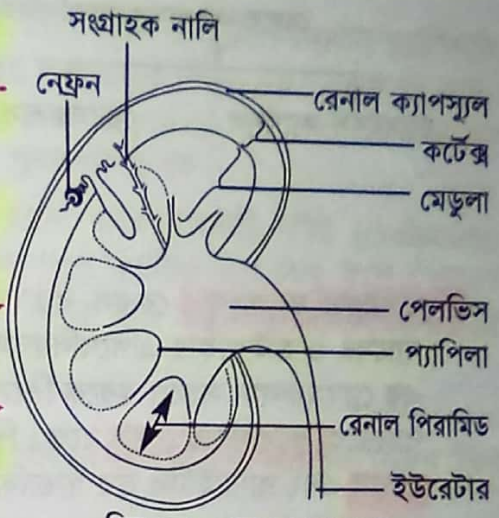

চিত্র ৬.২ : বৃক্কের লম্বচ্ছেদ

বৃক্কের অন্তর্গঠন : লম্বচ্ছেদে দেখা যায়, প্রত্যেক বৃক্ক তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত, যথা-বাইরের **কর্টেক্স** (cortex), মধ্যখানে অবস্থিত **মেডুলা** (medulla) এবং ভিতরে **পেলভিস** (pelvis)। পেলভিস হলো বৃক্ক অভ্যন্তরে বৃহৎ সংগ্রাহক স্থান, যা ইউরেটারের উপরের প্রসারিত অংশ থেকে গঠিত হয় এবং মেডুলার গঠনসমূহকে ইউরেটারের সাথে সংযুক্ত করে। মেডুলা ৮-১৮টি **রেনাল পিরামিড** (renal pyramid) নিয়ে গঠিত। রেনাল পিরামিড অনুদৈর্ঘ্যভাবে ডোরাকাটা এবং কোণাকার অঞ্চল। প্রতিটি পিরামিড **শীর্ষ প্যাপিলায়** শেষ হয়। প্যাপিলা হাইলামের দিকে নির্দেশিত। কর্টেক্স বৃক্কের সর্বাধিক বাইরের অংশ, এবং বহিঃস্থ **কর্টিক্যাল** (cortical) অঞ্চল ও অন্তঃস্থ **জাক্সটেমেডুলারি** (juxtamedulary) অঞ্চল নামক দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। কর্টেক্স অঞ্চলে নেফ্রনের রেনাল করপাসল, প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকা অবস্থান করে।

বৃক্কের কাজ : (i) রক্ত থেকে প্রোটিন বিপাকে সৃষ্ট নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য অপসারণ করা। (ii) দেহে এবং রক্তে পানির ভারসাম্য রক্ষা করা। (iii) রক্তে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফেট এবং ক্লোরাইডসহ বিভিন্ন লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা। (iv) রক্তে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করা। (v) যথাযথ আয়নিক কম্পোজিশন বজায় রাখা। (vi) হরমোন (যথা-এরিথ্রোপোয়েটিন) ক্ষরণ করা। (vii)এনজাইম (যথা-রেনিন, rennin) ক্ষরণ করা। (viii) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা। (ix) দেহে প্রবিষ্ট প্রতিবিষ ও ভেষজ পদার্থসমূহকে দেহ থেকে অপসারণ করা (X) vit-D

বৃক্কের সূক্ষ্ম গঠন (Ultra structure of kidney)

বৃক্কের গাঠনিক ও কার্যিক এককে **নেফ্রন** (nephron) বলে। মানুষের প্রত্যেক বৃক্কে ১০ লক্ষ থেকে ১২ লক্ষ নেফ্রন রয়েছে। প্রতিটি নেফ্রন প্রায় ৩ সে.মি. লম্বা। এ হিসেবে প্রত্যেক বৃক্কে নেফ্রনের নালিকাগুলো সম্মিলিতভাবে ৩৬ কি.মি. (প্রায় ২২.৫ মাইল) এরও বেশি লম্বা হবে। এর ফলে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ক্ষেত্র ব্যাপক বিস্তৃত হয়েছে। বৃক্কের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে রক্ত থেকে ১.২৫ ঘন সেমি. তরল পদার্থ পরিশ্রুত হয়। প্রায় ৯৯% পানিই আবার রক্তে ফিরে যায়, সাধারণত প্রতি মিনিটে কেবল ১ ঘন সেমি. মূত্র সৃষ্টি হয়।

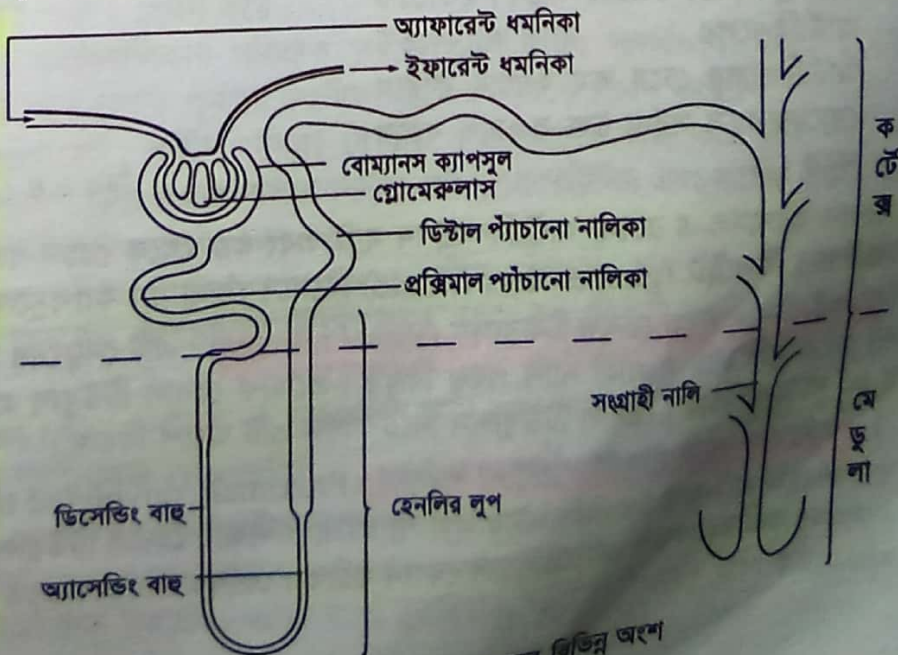

চিত্র ৬.৩ : একটি নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ

১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে **বোম্যান** (Bowman) প্রথম বৃক্কের সূক্ষ্ম গঠনের সঠিক বর্ণনা দেন। তাঁর মতে- প্রত্যেক নেফ্রন ২টি প্রধান অংশে বিভক্ত- **রেনাল করপাসল** এবং **বৃক্কীয় নালিকা** বা **রেনাল টিউব্যুলস**।

ক. রেনাল করপাসল (Renal corpuscle, বা ম্যালপিজিয়ান করপাসল বা ম্যালপিজিয়ান বডি): নেফ্রনের অগ্রপ্রান্তকে **রেনাল করপাসল** বলে। এটি বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থিত এবং **বোম্যানস ক্যাপসুল** (Bowman's capsule) ও **গ্লোমেরুলাস** (glomerulus) নিয়ে গঠিত।

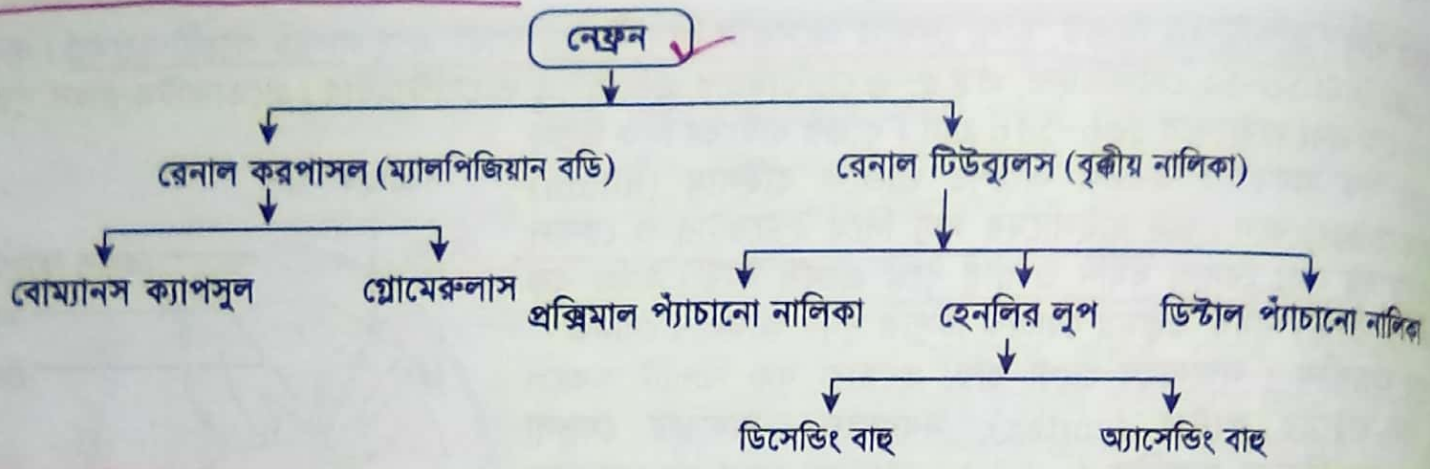

i. **বোম্যানস ক্যাপসুল :** রেনাল করপাসলে গ্লোমেরুলার কৈশিকজালিকাগুচ্ছকে ঘিরে অবস্থিত ০.২ মিলিমিটার ব্যাসের ও আঁইশাকার এপিথেলিয়ামে গঠিত দ্বিস্তরী পেয়ালার মতো প্রসারিত অংশকে **বোম্যানস ক্যাপসুল** বলে। এর গ্লোমেরুলাস সংলগ্ন স্তরকে ভিসেরাল স্তর, বহিঃপ্রাচীরকে প্যারাইটাল স্তর এবং দুই স্তরের মাঝখানে সরু গহ্বরকে **ক্যাপসুলার স্পেস** বলে। ভিসেরাল স্তরটি **পোডোসাইট** (podocyte) নামক বিশেষ ধরনের প্রবর্ধনযুক্ত কোষে এবং প্যারাইটাল স্তর স্বাভাবিক আঁইশাকার এপিথেলিয়াল কোষে নির্মিত।

ii. **গ্লোমেরুলাস :** বোম্যানস ক্যাপস্যুলের অভ্যন্তরে ঘনিষ্ঠভাবে গ্লোমেরুলাস অবস্থান করে। রেনাল ধমনি থেকে একটি ক্ষুদ্র **অন্তর্বাহী ধমনিকা** বা **অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল** (afferent arteriole) বোম্যানস ক্যাপস্যুলে প্রবেশ করে এবং ৫০-৬০টি কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয়ে গ্লোমেরুলাস গঠন করে। কৈশিকজালিকাগুলো পুনরায় মিলিত হয়ে **বহির্বাহী ধমনিকা** বা **ইফারেন্ট আর্টারিওল** (efferent arteriorle) রূপে বোম্যানস ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসে। ইফারেন্ট আর্টারিওলের ব্যাস অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলের চেয়ে কম হওয়ার কারণে গ্লোমেরুলাসে সর্বদা উচ্চ রক্তচাপ বজায় থাকে।

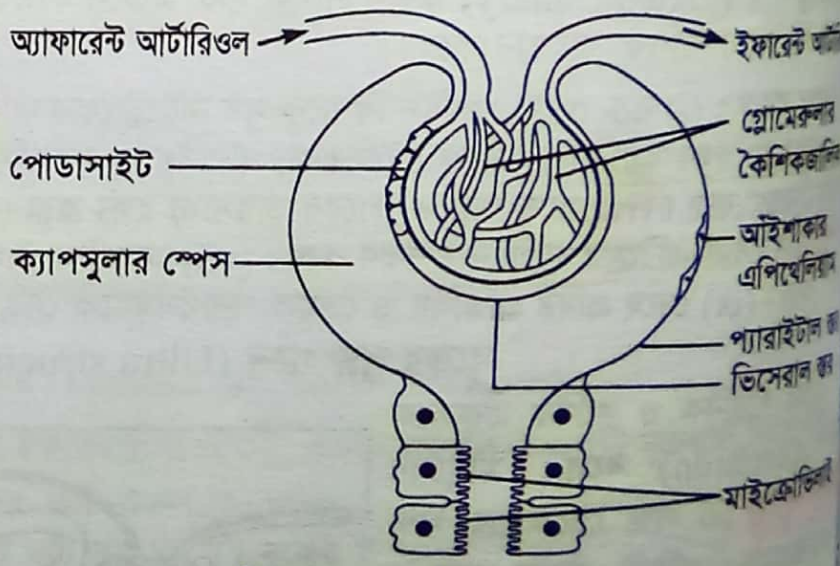

চিত্র ৬.৪ : একটি রেনাল করপাসল

রেনাল করপাসল-এ রক্তের আল্ট্রাফিলট্রেশন ঘটে এবং রক্ত থেকে রেচন বর্জ্য, পানি ও অন্যান্য দ্রব্য পরিস্রুত হয়ে **গ্লোমেরুলারস ফিলট্রেট** (glumerulars filtrate) হিসেবে বোম্যানস ক্যাপসুলে জমা হয়।

খ. বৃক্কীয় নালিকা বা রেনাল টিউব্যুলস (Renal tubules) : এটি নেফ্রনের পশ্চাৎ অংশ এবং বোম্যানস ক্যাপসুলের পেছন থেকে সৃষ্টি হয়ে সংগ্রাহী নালি পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রত্যেক রেনাল টিউব্যুল প্রায় ৩ সেন্টিমিটার লম্বা এবং গড় ব্যাস প্রায় ৬০ মাইক্রোমিটার। রেনাল টিউব্যুলস নিচে বর্ণিত ৩টি অংশে বিভক্ত।

i. **প্রক্সিমাল বা নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকা** (Proximal convoluted tubule) : বোম্যানস ক্যাপসুলের সাথে সংযুক্ত এটি প্রায় ১৪ মিলিমিটার লম্বা প্যাঁচানো নালিকা। রেনাল টিউব্যুলসের এ অংশ বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থিত এর প্রাচীর একস্তরী এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত। কোষগুলোর একপ্রান্তে অসংখ্য **মাইক্রোভিলাই** (microvilli) থাকে।

ii. **নেফ্রন ফাঁস বা হেনলির লুপ** (Loop of Henle) : প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকার শেষ প্রান্ত সোজা হয়ে বৃক্কের মেডুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি U আকৃতির ফাঁস বা **লুপ** (loop) গঠন করে পুনরায় কর্টেক্স অঞ্চলে ফিরে আসে। আবিষ্কারক জার্মান চিকিৎসক Friedrich Gustav Jakob Henle-এর নামানুসারে একে **হেনলির লুপ** বলা হয়। এর নিম্নমুখী নালিকে **ডিসেন্ডিং বাহু** (descending limb) এবং উর্ধ্বমুখী নালিকে **অ্যাসেন্ডিং বাহু** (ascending limb) বলে।

iii. **ডিস্টাল বা দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা** (Distal convulated tubule) : হেনলির লুপ-এর পরবর্তী এই প্যাঁচানো নালিকা প্রায় ৫ মিলিমিটার লম্বা এবং এটি বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থান করে। এর শেষপ্রান্ত সংগ্রাহী নালির সাথে যুক্ত থাকে। এর প্রাচীর একস্তরী এপিথেলিয়াম কোষ দিয়ে গঠিত।

রেনাল টিউব্যুলস-এর প্রক্সিমাল ও ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা সূক্ষ্ম কৈশিকজালিকা বা **পেরিটিউব্যুলস ক্যাপিলারি** (peritubules capillaries) দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। এগুলো নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন বস্তু পুনঃশোষণ করে। নেফ্রনের প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকায় **নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ** (selective reabsorption) ঘটে। এর হেনলির লুপ থেকে পানি এবং ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা কে সামান্য পানি ও অন্যান্য বস্তু পুনঃশোষিত হয়।

নেফ্রনের ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা যে সোজা নালির সাথে যুক্ত থাকে তাকে **সংগ্রাহী নালি** (collecting duct) বলে। একটি সংগ্রাহী নালিতে কয়েকটি নেফ্রন যুক্ত থাকে। এর কিছু অংশ কর্টেক্সে এবং কিছু অংশ মেডুলায় অবস্থান করে। এর প্রাচীর একস্তরী কোষে গঠিত। কয়েকটি সংগ্রাহী নালি মিলিত হয়ে **ডাক্ট অব বেলিনি** (duct of Bellini) গঠন করে।

বিভিন্ন ধরনের নেফ্রন

বৃক্কের কর্টেক্সে নেফ্রনের ম্যালপিজিয়ান বডি বা রেনাল করপাসলের অবস্থানের ভিত্তিতে মানুষের নেফ্রন তিন ধরনের, যথা–

১. **সুপারফিসিয়াল কর্টিকাল নেফ্রন** (Superficial cortical nephrons) : এগুলোর করপাসল বৃক্কের কর্টেক্সের বহির্ভাগের এক মিলিমিটারের মধ্যে অবস্থান করে। বৃক্কের ৮৫% নেফ্রনই এ প্রকৃতির। এগুলোর হেনলির লুপ খাটো।

২. **মিড কর্টিকাল নেফ্রন** (Midcortical nephrons) : এগুলোর রেনাল করপাসল কর্টেক্সের মাঝামাঝিতে অবস্থান করে। এদের লুপ খাটো বা লম্বা হয়ে থাকে। বৃক্কের মাত্র ৫% নেফ্রন এ প্রকৃতির।

৩. **জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন** (Juxtamedulary nephrons) : এগুলোর রেনাল করপাসল কর্টেক্সের গভীরে কর্টেক্স-মেডুলার সংযোগস্থলের ওপরে অবস্থান করে। এসব নেফ্রনের হেনলির লুপ অনেক লম্বা। বৃক্কের ১০% নেফ্রন এ প্রকৃতির।

নেফ্রনের কাজ

১. **পরিস্রুতকরণ** (Filtration) : নেফ্রনের গ্লোমেরুলাস রক্তের প্রোটিন ছাড়া প্রায় সকল উপাদান ছাঁকনির মাধ্যমে পৃথক করে বোম্যানস ক্যাপসুলের গহ্বরে প্রেরণ করে।

২. **পুনঃশোষণ** (Re-absorption) : বৃক্কীয়নালিকার পরিস্রুত তরলের প্রয়োজনীয় পদার্থগুলো যথা : গ্লুকোজ, অধিকাংশ লবণ এবং প্রয়োজনীয় পানি প্রভৃতি পুনরায় শোষিত হয়ে রক্তনালিতে প্রবেশ করে।

৩. **নালিকার ক্ষরণ** (Tubular Secretion) : বৃক্কীয় নালিকা যে শুধু পুনঃশোষণের কাজ করে তাই নয়, এটি কয়েক ধরনের দূষিত পদার্থ, যেমন– নানা প্রকার সালফারঘটিত যৌগ, ক্রিয়েটিনিন এবং কয়েক প্রকার জৈব এসিড ইত্যাদি রক্তপ্রবাহ থেকে নালিকার গহ্বরে ক্ষরণ করে।

৪. **নতুন পদার্থ সৃষ্টি** (Manufacture of New Substrances) : বৃক্কীয় নালিকার এপিথেলিয় কোষে কয়েক ধরনের যৌগের, যেমন– অজৈব ফসফেট, অ্যামোনিয়া, হিপপিউরিক এসিড ইত্যাদি সৃষ্টি করে নালিকার গহ্বরে যুক্ত হয়।

৫. **p^H মাত্রা নিয়ন্ত্রণ** (Balancing of p^H) : দেহস্থিত p^H এর সঠিক মাত্রা রক্ষা করে।

রেচনের শারীরবৃত্ত (Physiology of Excretion)

আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে দেহে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যপদার্থ সৃষ্টি হয়। এসব বর্জ্য দেহের জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত এবং যতশীঘ্র সম্ভব দেহ থেকে নিষ্কাশণ করা অত্যাবশ্যক। মানুষের প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত রেচন বর্জ্য হলো– ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি। এদের মধ্যে ইউরিয়ার পরিমাণ সর্বাধিক এবং এটি মূত্রের

সাথে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। যকৃতে ইউরিয়া উৎপন্ন হয় এবং রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে বৃক্কে পৌঁছায়। বৃক্ক মূত্র তৈরি হয়। রেচনে এরূপ ইউরিয়ার আধিক্য থাকাকে **ইউরিওটেলিজম** (ureotelism) বলে। যেসব প্রাণীতে ইউরিওটেলিজম দেখা যায় তাদের **ইউরিওটেলিক প্রাণী** (ureotelic animal) বলা হয়। মানুষ ইউরিওটেলিক হওয়ার কারণে রেচনের শারীরবৃত্তকে তাই দুটি শিরোনামে আলোচনা করা হলো : **ক. নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য উৎপাদন** এবং **খ. মূত্র সৃষ্টি।**

ক. নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য উৎপাদন (Production of Nitrogenous waste)

আমিষ খাদ্য পরিপাক হয়ে অ্যামিনো এসিডে পরিণত হয়। অ্যামিনো এসিড প্রধানত দেহ গঠন ও বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়। যকৃতে অব্যবহৃত ও অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড থেকে ডিঅ্যামাইনেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে **ডিঅ্যামিনেশন** (deamination) প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) হয়ে কিটো এসিড ও NH_2 সৃষ্টি করে। কিটো এসিড শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। অ্যামিনো গ্রুপ পরিবর্তিত হয়ে NH_3 (অ্যামোনিয়া) উৎপন্ন করে।

১. অ্যামিনো এসিড $\xrightarrow{\text{ডিঅ্যামিনেশন}}$ কিটো এসিড + $-NH_2$

২. $-NH_2 + H^+ \longrightarrow NH_3$ (অ্যামোনিয়া)

৩. $2NH_3 + CO_2 \xrightarrow{\text{অরনিথিন চক্র}} CO(NH_2)_2$ (ইউরিয়া) + H_2O

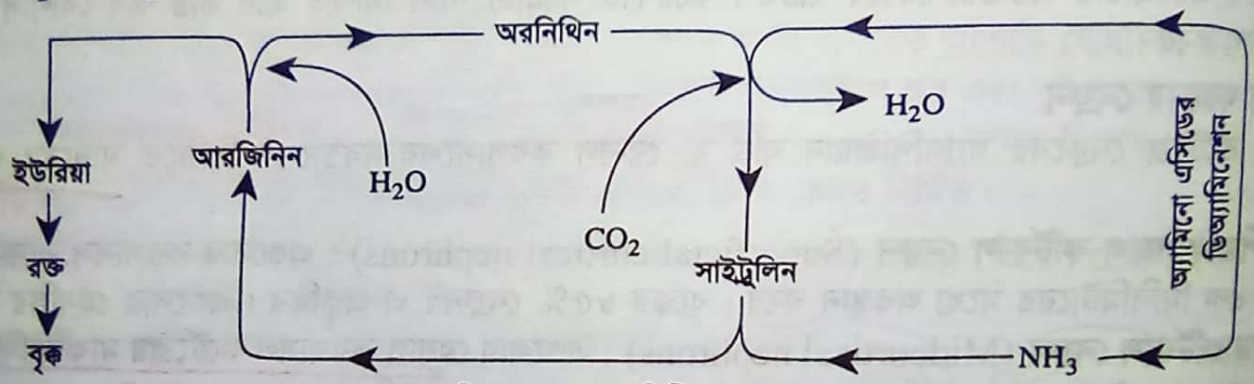

চিত্র ৬.৫ : অরনিথিন চক্র

NH_3 অত্যন্ত বিষাক্ত যা CO_2 এর সাথে মিলিত হয়ে যকৃতে অরনিথিন চক্রের (Ornithine cycle) মাধ্যমে কম ক্ষতিকর ও পানিতে দ্রবণীয় **ইউরিয়া** (urea)-য় পরিণত হয়। ইউরিয়া প্লাজমায় (রক্তরসে) অবস্থান করে এবং সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে বৃক্কে পৌঁছায়।

খ. মূত্র সৃষ্টি (Formation of Urine)

স্কটিশ শারীরবিজ্ঞানী Arthur Robertson Cushney (১৯১৭) এর মতে, নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ রক্তের মাধ্যমে বৃক্কের আসার পর তিনটি ধাপে মূত্র সৃষ্টি হয়। যথা: (১) **অতিসূক্ষ্ম পরিস্রাবণ,** (২) **টিউব্যুলার পুনঃশোষণ** এবং (৩) **সক্রিয় ক্ষরণ**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. অতিসূক্ষ্ম পরিস্রাবণ বা আল্ট্রাফিল্ট্রেশন (Ultra filtration): মূত্র তৈরির প্রথম ধাপ হচ্ছে রক্তের অতিসূক্ষ্ম পরিস্রাবণ। নেফ্রনের রেনাল করপাসলে এ পদ্ধতি সংঘটিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড থেকে পৃষ্ঠীয় ধমনি, রেনাল ধমনি এবং অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলের মাধ্যমে রক্ত অতি উচ্চ চাপে গ্লোমেরুলাসে প্রবেশ করে। সাধারণত অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলের তুলনায় ইফারেন্ট আর্টারিওলের ব্যাস সংকীর্ণ হওয়ায় গ্লোমেরুলাসে রক্তের উচ্চ চাপ সৃষ্টি হয়। এ **হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপে** রক্তের প্রোটিন ও রক্তকণিকা ছাড়া সমস্ত পানি, লবণ, শর্করা, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড প্রভৃতি কৈশিক জালিকার এন্ডোথেলিয়াম ও ভিত্তিঝিল্লি এবং রেনাল ক্যাপসুলের এপিথেলিয়াম ভেদ করে **ক্যাপসুলার স্পেস**-এ জমা হয়। এ পরিস্রুত তরলকে **গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট** (glomerular filtrate) বা প্রাথমিক মূত্র বলে। মানবদেহের দুটি বৃক্কের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে ১২০০ সিসি রক্ত প্রবাহিত হয়। এ রক্ত থেকে প্রায় ১২৫ সিসি গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট (পরিস্রুত) উৎপন্ন হয়ে বোম্যানস ক্যাপসুল-এ জমা হয়। অপরদিকে পরিস্রুত রক্ত পরে ইফারেন্ট আর্টারিওলে প্রবেশ করে। যে চাপের মাধ্যমে রক্তের দ্রাব্য বস্তু পরিস্রুত হয়, তাকে বলে **কার্যকর পরিস্রাবণ চাপ** (effective filteration pressure)। পরিস্রাবণ প্রক্রিয়াটি চাপ প্রয়োগের ফলে সংঘটিত হয় বলে একে **আল্টাফিল্ট্রেশন** বলা হয়।

২. টিউব্যুলার পুনঃশোষণ (Tubular reabsoption) বা **নির্বাচিত পুনঃশোষণ** (Selective reabsorption): বোম্যানস ক্যাপসুল থেকে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট রেনাল টিউব্যুলস-এ প্রবেশ করে। এখানে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটের ৮০% নির্বাচিত পদার্থ পুনঃশোষিত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে। টিউব্যুলস প্রাচীরের কোষগুলো পুনঃশোষণের জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত। যেমন - (i) কোষগুলোর একপাশে মাইক্রোভিলাই ও বেসাল চ্যানেল থাকায় এদের শোষণতল বেশি, (ii) সাইটোপ্লাজমে বেশি সংখ্যক মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে এবং (iii) রক্তের কৈশিক জালিকার সাথে ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে।

রেনাল টিউব্যুলসের বিভিন্ন অংশে যেসব পদার্থের পুনঃশোষণ হয় তা হলো –

(i) **প্রক্সিমাল** বা **নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকা :** এখানে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটের ৬০% পুনঃশোষিত হয়। গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ভিটামিন, হরমোন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড, ফসফেট, বাইকার্বোনেট, পানি ও কিছু ইউরিয়া এ অংশে পুনঃশোষিত হয়।

(ii) **হেনলির লুপ :** এখানে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় ৭০% পানি পুনঃশোষিত হয়।

(iii) **ডিস্টাল** বা **দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা :** এখানে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন আয়ন পুনঃশোষিত হয়। অ্যাল্ডোস্টেরন হরমোন এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। অন্যদিকে ADH (অ্যান্টি ডাইইউরেটিক হরমোন) পানি পুনঃশোষণে সাহায্য করে।

(iv) **সংগ্রাহী নালি :** এখানে প্রধানত পানি এবং কিছু পরিমাণ সোডিয়াম আয়ন পুনঃশোষিত হয়।

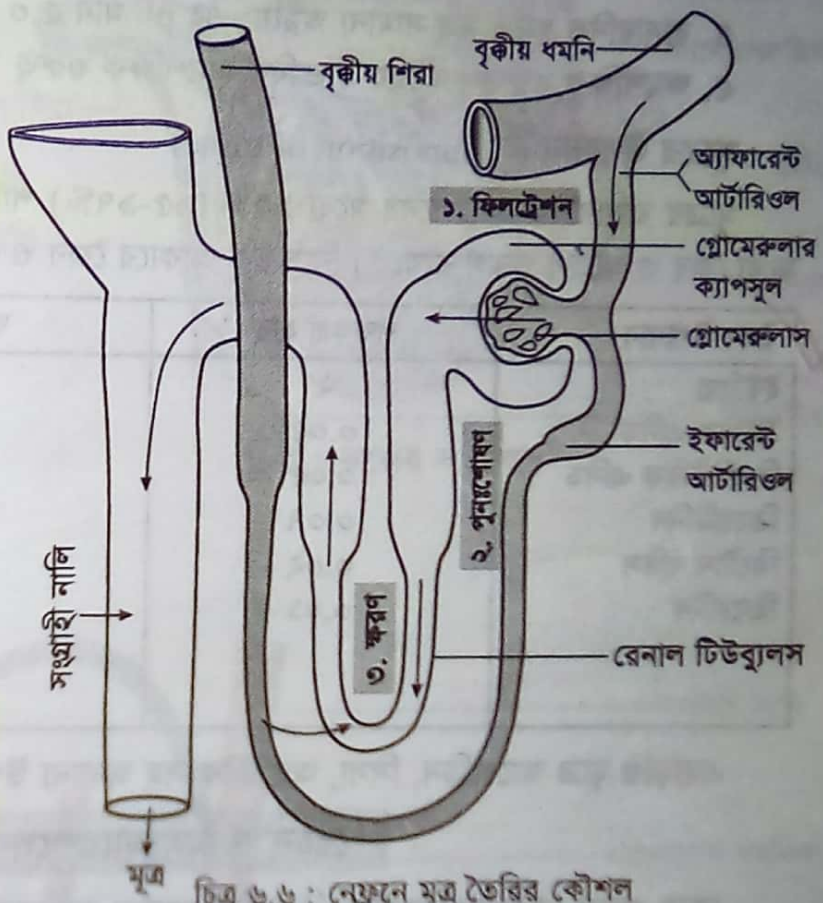

চিত্র ৬.৬ : নেফ্রনে মূত্র তৈরির কৌশল

৩. সক্রিয় ক্ষরণ (Active secretion) : বিপাক ক্রিয়ায় সৃষ্ট কিছু অপ্রয়োজনীয় উপজাত পদার্থ, যথা–ক্রিয়েটিনিন ও কিছু ইউরিয়া প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকার চারপাশে রক্তজালক থেকে সক্রিয় ক্ষরণের মাধ্যমে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটের সাথে যুক্ত হয়। ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকায় হাইড্রোজেন আয়ন, পটাসিয়াম ও অ্যামোনিয়াম আয়ন, সেরোটিনিন, কালিন, হিস্টামিন ইত্যাদি ক্ষরিত হয়ে ফিলট্রেটের সাথে মিশে **মূত্রে** (urine) পরিণত হয়। উৎপন্ন মূত্র অতঃপর সংগ্রাহী নালিকা, ইউরেটার হয়ে মূত্রথলি এবং মূত্রথলি থেকে মূত্রনালির মাধ্যমে বাইরে নিষ্কাশিত হয়।

মূত্র বা নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের গতিপথ নিচে দেখানো হলো :

বৃক্কপিণ্ড→অ্যাওর্টা→পৃষ্ঠীয় মহাধমনি→রেনাল ধমনি→অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল→গ্লোমেরুলাস→বোম্যান ক্যাপসুলের গহ্বর→রেনাল টিউব্যুলস→সংগ্রাহী নালি→বৃক্কের পেলভিস→ইউরেটার→মূত্রথলি→মূত্রনালি →রেচন ছিদ্র→দেহের বাইরে নিষ্কাশন।

মূত্র (Urine)

নেফ্রনের রেনাল টিউব্যুলসে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটের নির্বাচিত পুনঃশোষণের পর যে খড় বর্ণের, তীব্র ঝাঁঝালো ক্ষারযুক্ত ও অম্লধর্মী তরল রেচন বর্জ্য মূত্রথলিতে জমা হয় তাকে **মূত্র** বলে। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক গড়ে ১.৫ লিটার মূত্র ত্যাগ করে। তবে কতকগুলো কারণ এ পরিমাপকে প্রভাবিত করে থাকে। যেমন–খাদ্যে তরল পদার্থের পরিমাণ বেশি হলে মূত্রের মাত্রা বৃদ্ধি পায় ও শরীরে ঘাম বেশি হলে মূত্রের পরিমাণ কমে যায়। খাদ্যের প্রকৃতিও অনেক সময় মূত্রের পরিমাণের পার্থক্য ঘটায়। লবণাক্ত খাদ্য সাধারণত মূত্রের পরিমাণ বাড়ায়। বহুমূত্র (diabetes), বৃক্ক প্রদাহ (nephritis) জাতীয় রোগ প্রস্রাবের হার ও মাত্রা উভয়কে প্রভাবিত করে। কিছু দ্রব্য মূত্রের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাড়িয়ে দেয়। এসব দ্রব্য **ডাইইউরেটিকস** (diuretics) বা **মূত্রবর্ধক** নামে পরিচিত। পানি, লবণাক্ত পানি, চা এবং কফি এ ধরনের দ্রব্য।

মূত্রের বৈশিষ্ট্য

১. পরিমাণ : প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের বৃক্কে দৈনিক ০.৫ থেকে ২.৫ লিটার মূত্র উৎপন্ন হয়।

২. বর্ণ : মূত্রে **ইউরোক্রোম** নামক রঞ্জক পদার্থ থাকায় এটি খড় (হালকা হলুদ) বর্ণের হয়।

৩. গন্ধ : মূত্রের গন্ধ অনেকটা ঝাঁঝালো। দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ **ইউরিনোড** (C_6H_8O)-এর উপস্থিতির জন্য মূত্রে এরূপ গন্ধ হয়।

৪. রাসায়নিক ধর্ম : মূত্র সামান্য অম্লীয়; এর pH মান ৫.০ - ৬.৫।

৫. আপেক্ষিক গুরুত্ব : মূত্রের স্বাভাবিক আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০০৮ – ১.০৩০।

মূত্রের উপাদান (Composition of urine)

মূত্রের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে ৯৫% (৯৫-৯৭%) পানি এবং ৫% (৩–৫%) কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের মধ্যে জৈব ও অজৈব পদার্থ রয়েছে। নিচে ছক আকারে জৈব ও অজৈব উপাদানগুলো দেখানো হলো।

জৈব উপাদান	শতকরা হার %	অজৈব উপাদান	শতকরা হার %
ইউরিয়া	২	সোডিয়াম	০.৩৫
ইউরিক এসিড	০.০৫	পটাসিয়াম	০.১৫
হিপপিউরিক এসিড	০.০৫	অ্যামোনিয়াম	০.০৪
ক্রিয়েটিনিন	০.০৭	ম্যাগনেসিয়াম	০.০১
কিটোন বডিস	০.০২	ক্লোরাইড	০.৬০
ক্রিয়েটিন	০.০১	সালফেট	০.১৮
		ফসফেট	০.২৭
		ক্যালসিয়াম	০.০৩

এছাড়াও মূত্রে আয়োডিন, সিসা, আর্সেনিক সহ অন্যান্য উপাদান পাওয়া যায়।

রেচন ও অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা

কোষ থেকে নাইট্রোজেনঘটিত বিপাকীয় বর্জ্যের অপসারণের আরেক নাম **রেচন**। বিপাকীয় বর্জ্য দেহের জন্য অপ্রয়োজনীয়। দেহকোষ, টিস্যু ও অঙ্গে যে অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তার ফলে দেহের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় তা রেচনে এবং দেহের অসমোরেগুলেশনে (রক্তে পানি ও আয়নসাম্য রক্ষা) বৃক্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে রেচন ও অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো।

রেচনে বৃক্কের ভূমিকা (Role of Kidney in Excretion)

নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য বা রেচন পদার্থ হচ্ছে অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ইত্যাদি। আমিষ খাদ্য পরিপাক হয়ে অ্যামিনো এসিডে পরিণত হয়। অ্যামিনো এসিড প্রধানত দেহ গঠন ও বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়। অ্যামিনো এসিডের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেহে যতটুকু অ্যামিনো এসিড প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই ব্যবহৃত হয়, অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড দেহে সঞ্চিত থাকতে পারে না। ফলে অব্যবহৃত ও অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড থেকে যকৃতে ডিঅ্যামাইনেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে **ডিঅ্যামাইনেসন** প্রক্রিয়ায় NH_2 (অ্যামিনো গ্রুপ) পৃথক হয়ে কিটো এসিড ও NH_2 সৃষ্টি করে। কিটো এসিড শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) পরিবর্তিত হয়ে NH_3 (অ্যামোনিয়া) উৎপন্ন করে। অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া এবং ইউরিক এসিড ইত্যাদি নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য বা রেচন পদার্থ দেহে সঞ্চিত হলে দেহের **হোমিওস্টাসিস** (homeostasis) বা অন্তঃপরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়, এ কারণে জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে অপসারণ অত্যাবশ্যক। রেচনতন্ত্র জীবনহানিকর এসব নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য নিম্নলিখিত উপায়ে দেহ থেকে অপসারণ করে জীবন রক্ষা করে।

NH_3 অত্যন্ত বিষাক্ত যা CO_2 এর সাথে মিলিত হয়ে যকৃতে **অরনিথিন চক্রের** মাধ্যমে কম ক্ষতিকর ও পানিতে দ্রবণীয় ইউরিয়ায় পরিণত হয়। ইউরিয়া রক্তের প্লাজমায় অবস্থান করে এবং সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে বৃক্কে পৌঁছায়।

নেফ্রনের রেনাল করপাসলে রক্তের **আল্ট্রাফিল্ট্রেশন** সম্পন্ন হয়। আল্ট্রাফিল্ট্রেশনে রক্ত থেকে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ পরিশ্রুত হয়ে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট হিসেবে পানি ও অন্যান্য বস্তুর সাথে প্রক্সিমাল পাঁচানো নালিকায় গমন করে, এবং অবশেষে **মূত্র** হিসেবে দেহ থেকে অপসারিত হয়। এই রেচন পদার্থগুলো প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড থেকে সৃষ্টি হয়।

অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা (Role of Kidney in Osmoregulation)

অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়া বলতে জীবন্ত কোষ বা **দেহের অন্ত: ও বহি:পরিবেশের মধ্যে অভিস্রবণিক চাপের সমতা রক্ষাকে বুঝায়**। বৃক্ক দেহের **অভ্যন্তরীণ পরিবেশের স্থিতি বজায় রাখতে** (homeostasis) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহের পানি ও সোডিয়াম, পটাসিয়াম লবণ এবং ক্লোরাইড আয়নের মধ্যে একটি আন্তরসাম্য রক্ষা প্রক্রিয়াকে **অসমোরেগুলেশন** বলা হয়। দেহে অন্তঃঅভিস্রবণিক চাপের সমতা বিধান দেহের জন্য অপরিহার্য। দেহের মধ্যস্থ তরল পদার্থ ও দ্রবীভূত লবণসমূহের ঘনত্বের উপর অভিস্রবণ প্রক্রিয়া নির্ভর করে। কোষের অভ্যন্তরের তরল পদার্থ এবং কোষের বাইরে, যেমন-রক্তের প্লাজমা অংশ, টিস্যুরস ও লিম্ফ ইত্যাদি তরল পদার্থের গঠন একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখা অত্যাবশ্যক।

দেহে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পানি ও লবণের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যেমন, শ্বসনের মাধ্যমে কিছু পানি হারিয়ে যায়। ঘাম নিঃসরণের মধ্য দিয়ে শরীর থেকে কিছু পরিমাণ পানি নিষ্কাশিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেহ তরলের অভিস্রবণিক চাপের তেমন তারতম্য ঘটে না। কারণ বৃক্ক এই অভিস্রবণিক চাপকে তেমন বাড়তে বা কমতে দেয় না। মূত্রের সঠিক পরিমাণকে বজায় রেখে বৃক্ক দেহ তরলের পরিমাণ ও অভিস্রবণিক চাপকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন– খুব বেশি পরিমাণ পানি এক সঙ্গে পান করা হলে ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণ মূত্র ত্যাগ হয়। এরপর মূত্রের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে আসবে। বৃক্ক জানে কি পরিমাণ অতিরিক্ত পানি গ্রহণ করা হয়েছিল। আর প্রায় সেই পরিমাণ পানি শরীর থেকে নিষ্কাশিত করতে হবে।

অসমোরেগুরেশন পদ্ধতি : দেহে পানির সমতা রক্ষা করার জন্যে **এন্টি-ডাইইউরেটিক হরমোন** (Antidiuretic Hormone, ADH) নামক একটি হরমোন রয়েছে। ADH-কে **ভ্যাসোপ্রেসিন** (vasopressin)-ও বলা হয়। দেহের পানির পরিমাণ কম হলে রক্তে ADH এর পরিমাণ বেড়ে যায়, ফলে বৃক্ক অল্প পরিমাণ (মিনিটে ০.৫ মিলিলিটার) মূত্র উৎপন্ন করে এবং দেহের পানির পরিমাণ ঠিক থাকে। অন্যদিকে কোন কারণে পানির আধিক্য দেখা দিলে রক্তে ADH অতিমাত্রায় কমে যায় এবং দেহের পানির পরিমাণ বেড়ে যায় কারণ বৃক্কে পানি শোষণের ক্ষমতা কমে যায়। এ অবস্থায় মূত্রের পরিমাণ প্রতি মিনিটে ১৬ মিলিলিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। মস্তিষ্কের গোড়ায় **হাইপোথ্যালামাস** অংশে কিছু স্নায়ুকোষ এই ADH ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এখান থেকে **নিউরোসিক্রেশন** পদ্ধতির মাধ্যমে নিঃসৃত ADH পিটুইটারী গ্রন্থির মধ্যে পরিবাহিত হয় এবং রক্তে অবমুক্ত হয়। হাইপোথালামোসের মধ্যে উপস্থিত **অসমোরিসেপ্টর** (osmoreceptor) নামক স্নায়ুকোষ দেহ তরলের অভিস্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল, লক্ষণ ও করণীয় (Acute Kidney Failure, Symptoms and Measures)

বয়স বাড়ার সাথে সাথে বৃক্কের কাজকর্মেও (বিশেষ করে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায়) পরিবর্তন ঘটে, সক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসে। বলা হয়ে থাকে, ৭০ বছর বয়স্ক মানুষের বৃক্ক মাত্র ৫০% কাজে সক্ষম থাকে। রোগ-ব্যাধির কারণে বৃক্কের সক্ষমতা কমে যাওয়াকে **বৃক্ক বিকল** (kidney failure) বলে। বৃক্কের বৈকল্য দুভাবে দেখা দিতে পারে, একটি হচ্ছে **দীর্ঘক্ষণিক** (chronic), অন্যটি **তাৎক্ষণিক** (instantaneous)।

বৃক্কের বৈকল্য ঘটতে যদি কয়েক বছর লেগে যায় (অর্থাৎ ধীরে ধীরে বিকল হতে থাকে) তখন তা **দীর্ঘক্ষণিক বিকল**। অন্যদিকে, মাত্র ৪৮ ঘন্টার মধ্যে যখন বৃক্ক দেহের বর্জ্যপদার্থ অপসারণে, পানিসাম্য ও ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন বৃক্কের এ অবস্থাকে বৃক্কের **তাৎক্ষণিক বিকল** বলে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। কারণ বৃক্ক বিকলের ফলে দেহে যে পটাশিয়াম আয়ন উৎপন্ন হয় তা হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়াকে বন্ধ করে দেয়।

একটি কথা মনে রাখা দরকার যে মানবদেহে **দুটি বৃক্ক** থাকে। একটি বৃক্ক ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যটি যদি সুস্থ থাকে তাহলে সুস্থ বৃক্কই দুটি বৃক্কের কাজ সম্পন্ন করে।

এ উপঅধ্যায়ে সিলেবাসভুক্ত বৃক্কের শুধু তাৎক্ষণিক বিকল, লক্ষণ ও করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের কারণ

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের কারণগুলো হচ্ছে– (i) ডিহাইড্রেশনের (পানিশূন্যতা) কারণে দেহে পানির পরিমাণ যথেষ্ট কমে গেলে; (ii) বড় কোনো ক্ষত থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে বৃক্কে রক্ত প্রবাহ কমে গেলে; (iii) অতিমাত্রায় ডায়ারিয়া ও বমির কারণে; (iv) শক, হার্ট অ্যাটাক, অ্যাকিউট গ্ল্যানক্রিয়াটাইসিস, ভুল রক্ত দেয়ার জন্য, মারাত্মক অগ্নিদগ্ধ হওয়ায়, রক্ত প্রবাহ কমে গেলে; (v) বৃক্কে পাথর, মূত্রনালিতে টিউমার বা জন্মগত ত্রুটি থাকলে, পুরুষে প্রোস্টেট গ্রন্থি বড় হয়ে গেলে, উদরে ক্যান্সার হলে; (vi) অতি মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক (যেমন-জেন্টামাইসিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন), ব্যাথানাশক ঔষধ (যেমন-আসপিরিন, আইবুপ্রোফেন), রক্তচাপের ঔষধ (যেমন-এসিই ইনহিবিটর) সেবনে; (vii) বিষাক্ত পদার্থ, যেমন কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, আর্সেনিক, লেড, মার্কারি ইত্যাদি গ্রহণে; এবং (viii) বৃক্কের টিস্যু ও পরিস্রাবক এককগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে।

বৃক্ক বিকলের লক্ষণ

তাৎক্ষণিক বৃক্ক বিকল-এর লক্ষণগুলো হচ্ছে : (i) অতি অল্প, ঘন ও গাঢ় মূত্র ত্যাগ বা মূত্র একেবারেই না হওয়া; (ii) রক্তে নাইট্রোজেনজাত বর্জ্যপদার্থ সঞ্চিত হওয়া; (iii) শরীর ফুলে যাওয়া (অতিরিক্ত পানি মূত্র হিসেবে দেহে জমে যাওয়ায়); (iv) পাঁজর ও কোমরের মাঝামাঝি দুপাশে ব্যথা (flank pain); (v) ক্ষুধামান্দ্য, বমি-বমিভাব ও বমি করা; (vi) উচ্চ রক্তচাপ; রক্ত পায়খানা; (vii) হাত-পায়ে সংবেদ কমে যাওয়া; (viii) অনেকক্ষণ ধরে হেঁচকি তোলা এবং (ix) ঘন ঘন শ্বাস প্রভৃতি।

প্রতিকার / করণীয় (Measures)

বৃক্ক বিকল অত্যন্ত জটিল রোগ। তাৎক্ষণিক বৃক্ক বিকল আরও জটিল বিষয়। তাই এ রোগের প্রতিকার করতে হলে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। লক্ষণের দু-একটি বৈশিষ্ট্য দেখেই খাদ্য ও পথ্য বিষয়ে নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ জীবনের জন্যে মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। শুধু তাই নয়, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে এ রোগের চিকিৎসার আরেক অর্থ হচ্ছে "অর্থ দিয়ে অনর্থ" ডেকে আনা।

বৃক্ক বিকলের প্রতিকারে বিশেষজ্ঞরা ৩টি পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন– ১. **নিয়ন্ত্রিত আহার**, ২. **ডায়ালাইসিস** এবং ৩. **বৃক্ক প্রতিস্থাপন**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. নিয়ন্ত্রিত আহার (Controlled Diet)

বৃক্ক বিকলের চিকিৎসায় প্রথমেই নজর দিতে হয় সহজ-সুলভ-সস্তা পদ্ধতির উপর। এটি হচ্ছে খাদ্যদ্রব্য। নিয়ন্ত্রিত আহারের মধ্যে রয়েছে : (ক) কম পরিমাণ প্রোটিন গ্রহণ (ফলে কম ইউরিয়া উৎপন্ন হবে); (খ) কম লবণ ও পানি গ্রহণ (মূত্রের পরিমাণ হবে কম); এবং (গ) কম পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ, যেমন-কমলা, চকলেট, মাশরুম (রক্তে উচ্চমাত্রার K^+ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে দিতে পারে)। নিয়ন্ত্রিত আহার গ্রহণের পরও যদি রক্তে ইউরিয়ার মাত্রা বেশি থাকে তাহলে বৃক্ককে **ডায়ালাইসিস** প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা দেওয়া, নয়তো সবশেষে বৃক্ক প্রতিস্থাপনের কথা চিন্তা করতে হবে।

২. ডায়ালাইসিস (Dialysis)

একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লির ভিতর দিয়ে নির্বাচনমূলক ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোনো দ্রবণের কলয়ডাল পদার্থ থেকে দ্রবীভূত পদার্থের পৃথকীকরণকে **ডায়ালাইসিস** বলে। তাৎক্ষণিক বৃক্ক বিকল চিকিৎসায় এ প্রক্রিয়াকে কৃত্রিম বৃক্কের পরিবেশ রচনা করে রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ ও অতিরিক্ত পানি অপসারণ করা হয়।

ডায়ালাইসিস দুধরনের– ক. **হিমোডায়ালাইসিস** (Haemodialysis) এবং খ. **পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস** (Peritoneal dialysis)।

ক. হিমোডায়ালাইসিস : এ প্রক্রিয়ার শুরুতে কিছু যন্ত্রপাতি, দ্রবণ ও টিউবের সমন্বয়ে একটি **কৃত্রিম বৃক্ক** নির্মাণ করা হয়। কৃত্রিম বৃক্ক আসল বৃক্কের মতো একই নীতি অনুসরণ করে কাজ করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে রক্তকে পাম্প দিয়ে শরীর থেকে বের করে বর্জ্যপদার্থ অপসারণের উদ্দেশে পরিস্রুত করে যেভাবে আবার দেহে ফেরত পাঠানো হয় তাকে **হিমোডায়ালাইসিস** বলে। পদ্ধতিটি নিম্নরূপঃ-

রোগীর দেহে একটি ধমনির ভিতর ফাঁপা নলাকার সূঁচ ঢোকানো হয়। এর নাম **ক্যাথেটার** (catheter)। এটি পেছন দিকে একটি নমনীয় টিউবের সাথে লাগানো থাকে। টিউবটি প্রথমে কিডনি মেশিনের সঙ্গে যুক্ত হয়, পরে একটি শিরায় এসে মিলিত হয়। বাহুর নিম্নপ্রান্ত বা পায়ে ক্যাথেটার লাগানো হয়। যাদের ঘন ঘন ডায়ালাইসিস হয় তাদের ক্ষেত্রে একটি ছোট টিউবসহ ক্যাথেটারটি স্থায়ীভাবে লাগিয়ে রাখা হয়।

পাম্পের সাহায্যে সযত্নে ধমনি থেকে রক্ত বের করে শিরার দিকে চালনা করা হয়। রক্তে **হেপারিন** (heparin) মেশানো হয় যাতে জমাট না বাঁধে। রক্ত ধীরে ধীরে কিডনি মেশিনের **ডায়ালাইসিস দ্রবণ** বা **ডায়ালাইসেট** (dialysate) এ শায়িত টিউবের ভিতর দিয়ে সংবহিত হয়। টিউবগুলো কৃত্রিম **আংশিকভেদ্য** (partially permeable) ঝিল্লি-নির্মিত যা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অতিক্ষুদ্র অণু ও পানিকে ব্যাপিত হওয়ার সুযোগ দেয়। রক্তকণিকা, প্লেটলেট (অণুচক্রিকা) ও প্রোটিন অণু বড় হওয়ায় ব্যাপিত হতে পারে না।

চিত্র ৬.৭ : হিমোডায়ালাইসিস মেশিন

রক্ত ও ডায়ালাইসেট (ডায়ালাইসিস দ্রবণ)-এর মধ্যে সমতা না আসা পর্যন্ত বিনিময় অব্যাহত থাকে। রক্তের অবাঞ্ছিত বস্তু বিশেষ করে ইউরিয়া ও অতিরিক্ত সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি অপসারিত হয়, প্রয়োজনীয় বস্তু থেকে যায়।

প্রতি সপ্তাহে রোগীকে অন্ততঃ দুবার হিমোডায়ালাইসিসের সম্মুখীন হতে হয়। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে ৬-৮ ঘন্টা সময় লাগে। প্রতিবার সদ্য বানানো ডায়ালাইসেট ব্যবহার করতে হয়।

ডায়ালাইসেটের উপাদান : হিমোডায়ালাইসিসের উদ্দেশে ডায়ালাইসিস টিউবগুলোকে যে দ্রবণে রাখা হয় তাকে **ডায়ালাইসেট** বলে। এর উপাদনগুলো হচ্ছে- সঠিক তাপমাত্রা (স্থির দেহ তাপমাত্রা); সঠিক আয়নিক ভারসাম্য, বিশেষ করে Na^+, K^+, Cl^-, Mg^{2+}, Ca^{2+} ও HCO_3 (এসিটেট রূপে); অতিরিক্ত পুষ্টি, যেমন গ্লুকোজ; সঠিক p^H ও বাফারিং ক্ষমতা (buffering capacity) ইত্যাদি।

খ. পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস : কৃত্রিম ঝিল্লির পরিবর্তে দেহে অবস্থিত অকৃত্রিম পেরিটোনিয়াল ঝিল্লি (পেরিটোনিয়াম)-কে ডায়ালাইসিং ঝিল্লি হিসেবে ব্যবহার করে বৃক্কের ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়াকে **পেরিটোনিয়াল**

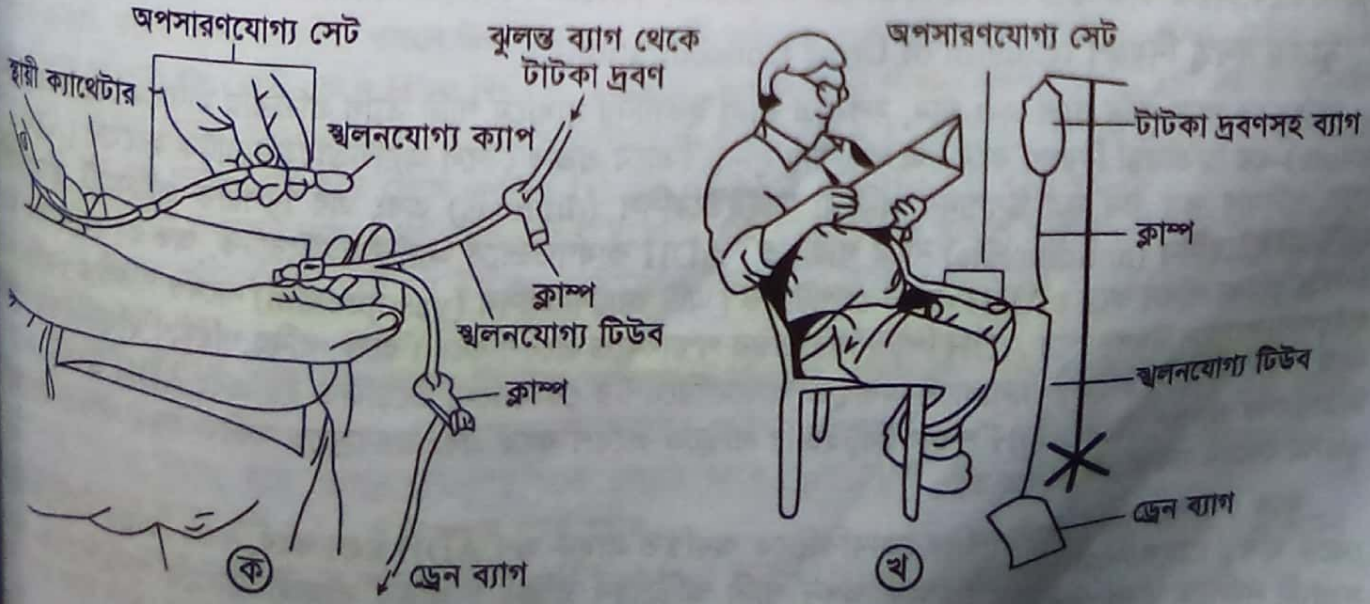

চিত্র ৬.৮ : পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়া

ডায়ালাইসিস বলে। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে রোগীর উদর প্রাচীরে একটি ছোট চেরাছিদ্র করে তার ভেতর দিয়ে সরু প্লাস্টিক টিউব উদরীয় গহ্বরে প্রবেশ করানো ও স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়া হয়। উদরীয় গহ্বরের প্রাচীরটি পেরিটোনিয়াম যা আংশিক ভেদ্য এবং ডায়ালাইসিং ঝিল্লি হিসেবে কাজ করে। প্লাস্টিক টিউবের ভিতর দিয়ে ডায়ালাইসেট উদরীয় গহ্বরে প্রবেশ করিয়ে কয়েক ঘন্টা রেখে দেওয়া হয়। ডায়ালাইসেট ও উদরের বাকি অংশের টিস্যু-তরলের মধ্যে উপাদানের বিনিময় ঘটে। দিনে ৩-৪ বার ডায়ালাইসেট প্রতিস্থাপন করা যায়।

৩. বৃক্ক প্রতিস্থাপন (Kidney Transplant)

বৃক্ক বিকলের দীর্ঘকালীন সমাধানে রোগীর দেহে ভিন্ন ব্যক্তির সুস্থ ও সঠিক বৃক্ক স্থাপনকে **বৃক্ক প্রতিস্থাপন** বলে। বৃক্ক বিকলের চিকিৎসায় ডায়ালাইসিস পদ্ধতি সাময়িক সমাধান হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যয় সাপেক্ষ মনে হলেও দীর্ঘকালীন হিসেবে বৃক্ক প্রতিস্থাপনই ভালো পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হচ্ছে। স্থায়ীভাবে নষ্ট বৃক্কের বিকল্প হিসেবে একটি সুস্থ বৃক্ক প্রতিস্থাপনই স্থায়ী সমাধান হতে পারে।

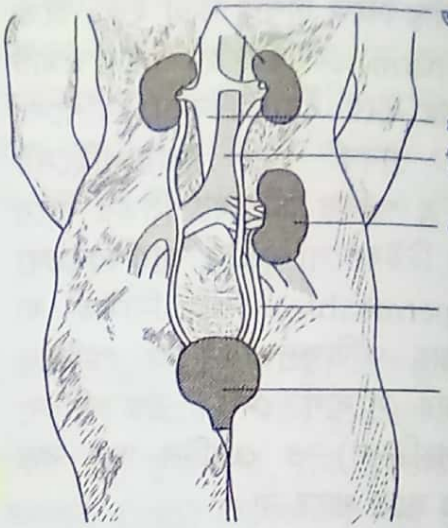

চিত্র ৬.৯ : বৃক্ক প্রতিস্থাপন

বৃক্ক প্রতিস্থাপনে অবশ্য স্মরণীয় বিষয় হচ্ছে–

১. বৃক্কদাতা (অনাত্মীয় বা আত্মীয়) যেই হোক না কেন তার দেহ থেকে সংগ্রহের ঠিক ৪৮ ঘন্টার মধ্যে রোগীর দেহে স্থাপন করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে যতখানি সময় বৃক্কটি বাইরে থাকে ততক্ষণ বৃক্কের উপর দিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে ঠান্ডা স্যালাইন দ্রবণ প্রবাহিত করা হয়। দাতা মৃত হলে সদ্যমৃত দাতার দেহ থেকে বৃক্ক সংগ্রহ করতে হবে।

২. সংগৃহীত বৃক্কটি সুস্থ হতে হবে (HIV বা অন্যান্য সংক্রমণমুক্ত হতে হবে)।

৩. বৃক্কদাতা ও গ্রহীতার ব্লাড গ্রুপ এবং টিস্যুর ধরণ এক হতে হবে।

৪. বৃক্ক প্রতিস্থাপনের সময় প্রথমে গ্রহীতার শ্রোণীদেশে অপারেশনের মাধ্যমে দাতাবৃক্কটিকে স্থাপন করা হয়। দাতাবৃক্কের ধমনি ও শিরাকে গ্রহীতার ধমনি ও শিরার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। নতুন বৃক্কের ইউরেটারকে পৃথকভাবে মূত্রনালির সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। এভাবে বৃক্কের প্রতিস্থাপন ঘটে।

হরমোনাল ক্রিয়া (Hormonal Activities)

উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি শারীরবিজ্ঞানী **ক্লড বার্নার্ড** (Claude Bernard) সর্বপ্রথম প্রাণিদেহের অন্তঃপরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার কৌশলের উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে মানবদেহে মূত্রের ঘনত্ব, রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা ও রক্তের পিএইচ নিয়ন্ত্রণে মূল কার্যকর উপাদান হিসেবে **হরমোন** কিভাবে জটিল ও সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ত কাজ করে চলেছে বিজ্ঞানীরা তা উদ্ভাবন করেছেন। নিচে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

মূত্রের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ (Control of Urine Concentration)

আহারের সঙ্গে পানি গ্রহণ এবং ঘাম, মল-মূত্র ত্যাগ ইত্যাদির মাধ্যমে পানি ত্যাগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহ রক্তের দ্রব (solute)-এর স্থিতাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রভাব ফেলে অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন (ADH)। বিপুল পরিমাণ কম ঘন মূত্র উৎপাদন প্রক্রিয়া **ডাইইউরেসিস** (diuresis) এবং এর বিপরীত প্রক্রিয়াটি স্বভাবতই **অ্যান্টিডাইইউরেসিস** (antidiuresis) নামে পরিচিত। ADH কার্যগতভাবে অ্যান্টিডাইইউরেটিক, অতএব বেশি ঘন মূত্র উৎপন্নে ভূমিকা পালন করে। ADH একটি পেপটাইড। এটি **ভ্যাসোপ্রেসিন** (vasopressin) নামেও পরিচিত। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে উৎপন্ন হয়ে ADH পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাৎখন্ডে প্রবেশ করে। রক্তে পানির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত অসমোরিসেপ্টর কোষগুলো উত্তেজিত হয় এবং ADH উৎপন্ন করে। নিউরোনের অ্যাক্সন বেয়ে ADH পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থিতে প্রবেশ করে এবং রক্তস্রোতে ক্ষরিত হয়। ক্ষরিত হরমোন বৃক্কসহ দেহের সব অংশে বাহিত হয়।

বৃক্কে নেফ্রনগুলোর সংগ্রাহী নালির কোষঝিল্লিতে অবস্থিত গ্রাহক অণু ADH গ্রহণ করে, ফলে ঝিল্লির পানিভেদ্যতা বেড়ে যায়। গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট থেকে তখন পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বৃক্কের সংগ্রাহী নালিতে পুনঃশোষিত হয়। সংগ্রাহী নালিতে তরল বেশ ঘন হয়ে যায় এবং ব্যক্তি অল্প পরিমাণ অতিঘন মূত্র উৎপন্ন করে।

অন্যদিকে, রক্তে পানির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে হাইপোথ্যালামাসের অসমোরিসেপ্টর কোষগুলো তেমন উত্তেজিত হয় না এবং অতি অল্প পরিমাণ ADH ক্ষরিত হয়। তখন সংগ্রাহী নালির কোষগুলো প্রায় পানি-অভেদ্য হয়ে যায়, ফলে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট থেকে পানি পুনঃশোষণ বন্ধ থাকে। সংগ্রাহী নালিতে তখন ফিলট্রেট অনেক তরল হয়ে যায় এবং ব্যক্তি বেশি পরিমাণ অতিতরল মূত্র উৎপন্ন করে। দেহে পানির সমতা ফিরে না আসা পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। রেনাল ক্যাপস্যুলে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া সবসময় অব্যাহত থাকে। পানির অভাবে রক্তরসের গাঢ়তা বাড়লে কিংবা পরিমাণ কমে গেলে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত **অ্যালডোস্টেরণ** (aldosterone) হরমোন মূত্রে সোডিয়াম আয়নের রেচন কমিয়ে পরোক্ষভাবে পানির রেচনও হ্রাস করে।

রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Control of Sodium in Blood)

রক্তের প্লাজমায় সোডিয়ামের মাত্রা স্থির রাখতে যে হরমোনটি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে সেটি হচ্ছে **অ্যালডোস্টেরণ** (aldosterone)। এ হরমোনও পানি পুনঃশোষণকে প্রভাবিত করে। অ্যালডোস্টেরণ ক্ষরিত হয় অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স (বহিঃস্থ) অঞ্চল থেকে ।

রক্তে সোডিয়াম কম হলে অভিস্রবণের মাধ্যমে কম পানি প্রবেশ করে, তাই রক্তের আয়তন কমে যায়। এর ফলে চাপও হ্রাস পায়। চাপ ও আয়তন হ্রাস পেলে ডিস্টাল নালিকা ও অ্যাফারেন্ট ধমনিকার মাঝখানে অবস্থিত **জাক্সটাগ্লোমেরুলার কমপ্লেক্স** (juxtaglomerular complex) নামে একগুচ্ছ সংবেদী কোষ উদ্দীপ্ত হয় এবং **রেনিন** (renin) এনজাইম ক্ষরণ করে। যকৃত থেকে উৎপন্ন ও প্লাজমায় অবস্থিত একধরনের প্রোটিনকে রেনিন সক্রিয় করে **অ্যাঞ্জিওটেনসিন** (angeotensin) হরমোনে পরিণত করে। এ হরমোন অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে অ্যালডোস্টেরণ ক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে। অ্যালডোস্টেরণ রক্তবাহিত হয়ে বৃক্কের ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকায় পৌঁছায় এবং নালিকার কোষগুলোতে **সোডিয়াম-পটাসিয়াম পাম্প** (sodium-potassium pump)-কে উদ্দীপ্ত করে। ফলে ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা থেকে সোডিয়াম আয়ন বেরিয়ে নালিকার চারপাশের কৈশিকজালিকায় প্রবেশ করে। অন্যদিকে, পটাসিয়াম আয়ন প্রবেশ করে কৈশিকজালিকা থেকে ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকায়। অ্যালডোস্টেরণ অন্ত্রে সোডিয়াম শোষণকে এবং ঘামে সোডিয়াম ত্যাগকে উদ্দীপ্ত করে। এ দুই প্রক্রিয়ার ফলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। এ কারণে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় রক্তে প্রচুর পানি প্রবেশ করে রক্তের আয়তন ও চাপ উভয়ই বেড়ে যায়।

রক্তের পিএইচ নিয়ন্ত্রণ (Control of Blood p^H)

পিএইচ (p^H) হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্বের একটি পরিমাপক। নিরপেক্ষ p^H হচ্ছে 7.0, এসিড p^H হয় 7-এর নিচে, আর ক্ষারীয় p^H হচ্ছে 7-এর উপরে। কিছু রাসায়নিক পদার্থ দ্রবণে p^H-এর পরিবর্তনকে প্রতিহত করতে সক্ষম। এসব পদার্থকে বলে **বাফার** (buffers)। রক্তের প্লাজমার স্বাভাবিক p^H হচ্ছে 7.4। এ মাত্রা যথাসম্ভব বজায় না রাখলে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

দেহে ক্ষারের চেয়ে এসিড বেশি উৎপন্ন হয়। অতএব, এসিডিটি কমানোর বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। এসিডিটি বেড়ে যাওয়ার একটি কারণ হচ্ছে কোষীয় শ্বসনে উৎপন্ন CO_2। এটি দ্রবীভূত হয়ে H_2CO_3 (কার্বনিক এসিড) নামে একটি দুর্বল এসিডে পরিণত হয়। এটি ভেঙ্গে H^+ ও HCO_3^- (হাইড্রোজেন কার্বনেট আয়ন) উৎপন্ন হয়। CO_2 এর ঘনত্ব বেশি হয়ে গেলে পরিত্রাণ পেতে প্রতিবর্ত সাড়া হিসেবে শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়। HCO_3^- বাফার হিসেবে কাজ করতে পারে কারণ H^+ এর ঘনত্ব বেশি হয়ে গেলে এগুলো H^+ এর সাথে যুক্ত হয়ে H_2CO_3 গঠন করে।

রক্তে HCO_3^- ও ফসফেট বাফার অতিরিক্ত H^+ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এ কারণে রক্তের p^H কমে না। প্লাজমার স্বাভাবিক p^H এ যেন পরিবর্তন না ঘটে সে উদ্দেশে নেফ্রনের প্রক্সিমাল ও ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা এবং সংগ্রাহী নালি রক্ত দুভাবে কাজ করে।

১. রক্ত অতিএসিডিক হতে শুরু করলে ডিস্টাল নালিকা ও সংগ্রাহী নালির কোষগুলোর সাহায্যে রক্ত থেকে H^+ **সক্রিয় পরিবহন** (active transport)-এর মাধ্যমে নালিকাতে পরিবাহিত হয়। CO_2 যদি H^+ এর উৎস হয়ে থাকে তবে HCO_3^-ও উৎপন্ন হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তে ফেরত যাবে। p^H বেড়ে গেলে বিপরীত ঘটনা ঘটবে। এসব পরিবর্তনের কারণে মূত্রের p^H 4.5 – 8.5 পর্যন্ত হতে পারে।

২. p^H কমে গেলেও বৃক্ককোষে অ্যামোনিয়াম বেইস (base) আয়ন (NH_4^+) সৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত হয়। NH_4^+ এসিডের সাথে যুক্ত হয়ে বৃক্কে বাহিত হয় এবং অ্যামোনিয়াম লবণ হিসেবে রেচিত হয়।

ব্যবহারিক

বৃক্কের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ

বৃক্কের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণে নিচে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যাবে।

১. বাইরে **কর্টেক্স** ও ভেতরে **মেডুলা**-এ দুটি অংশ নিয়ে গঠিত।

২. এতে অসংখ্য প্যাঁচানো নালিকা বা **নেফ্রন** অবস্থিত।

৩. প্রত্যেক নেফ্রনের অগ্রভাগে একটি করে পেয়ালার মতো গঠন রয়েছে। এর নাম **বোম্যানস ক্যাপসুল**। পেয়ালার অভ্যন্তরে **গ্লোমেরুলাস** নামক একগুচ্ছ কৈশিকনালি রয়েছে।

৪. নেফ্রনের ফাঁকে ফাঁকে **মেডুলারি রশ্মি** অবস্থিত।

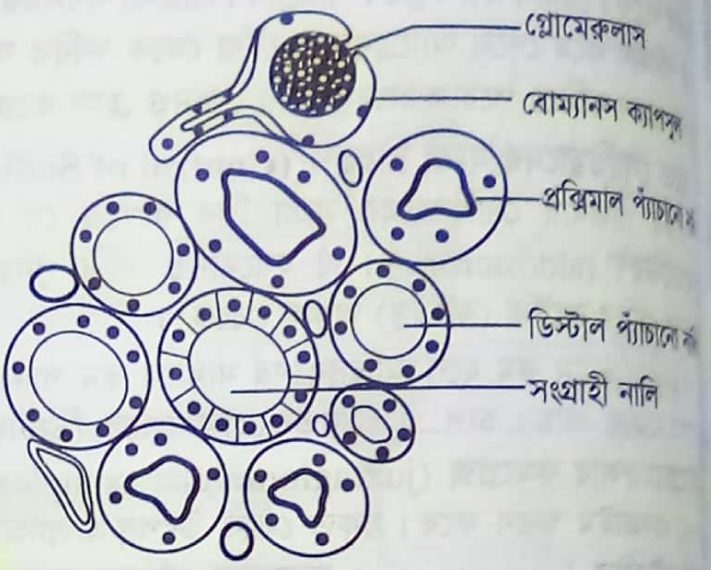

চিত্র ৬.১০ : বৃক্কের অনুচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

নেফ্রন : বৃক্কের গঠন ও কাজের একককে নেফ্রন বলে। মানুষের এক একটি বৃক্ক প্রায় ১০-১২ লক্ষ নেফ্রন নিয়ে গঠিত।

রেনাল করপাসল : বৃক্কের কর্টেক্স অঞ্চলে অবস্থিত নেফ্রনের সম্মুখ অংশকে রেনাল করপাসল বলে। এটি প্রায় ০.২ মি.মি. ব্যাসের একটি গোলাকার অংশ। আবিষ্কারক Marcello Malpighi-র নামানুসারে একে **মালপিজিয়ান বডি** বলে। এটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত – (i) বোম্যানস ক্যাপসুল ও (ii) গ্লোমেরুলাস।

বোম্যানস ক্যাপসুল : রেনাল করপাসলে গ্লোমেরুলাসকে ঘিরে অবস্থিত একটি বদ্ধ ও পেয়ালার মতো অঙ্গকে বোম্যানস ক্যাপসুল বলে।

গ্লোমেরুলাস : বোম্যানস ক্যাপসুলের অভ্যন্তরে অন্তর্বাহী রেনাল ধমনিকার কৈশিকনালির জালিকাকার গুচ্ছকে গ্লোমেরুলাস বলে।

হেনলির লুপ : নেফ্রনের প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকার শেষ প্রান্ত সোজা হয়ে মেডুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে একটি 'U' আকৃতির লুপ গঠন করে, একে হেনলির লুপ বলে।

মূত্র : নেফ্রনের গ্লোমেরুলাসে রক্তের আল্ট্রাফিল্ট্রেশনের পর বৃক্ক নালিকার বিভিন্ন অংশে পরিস্রুত তরলের পুনঃশোষণ এবং সক্রিয় ক্ষরণের পর হালকা খড় বর্ণের এবং বিশেষ ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত যে অপ্রয়োজনীয় নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য তরল মূত্রনালি পথে দেহের বাইরে নিষ্কাশিত হয় তাকে মূত্র বলে।

অসমোরেগুলেশন : জীবন্তকোষ বা দেহের অন্তঃ ও বহিঃ পরিবেশের অভিস্রবণিক চাপের সমতা রক্ষার প্রক্রিয়াকে অসমোরিগুলেশন বলে।

বৃক্ক বিকল : বৃক্কের কার্যকারিতা কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়াকে বৃক্ক বিকল বলে।

ডায়ালাইসিস : বৃক্ক বিকল হলে কৃত্রিম উপায়ে রক্ত থেকে বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থাকে ডায়ালাইসিস বলে।

বৃক্ক প্রতিস্থাপন : যখন কোনো ব্যক্তির বৃক্ক স্থায়ীভাবে বিকল বা অকোজো হয়ে পড়ে তখন কোনো সুস্থ ব্যক্তির বৃক্ক তার দেহে সংযোজন করা হয়, তখন তাকে বৃক্ক প্রতিস্থাপন বলে।

বাফার : দেহ তরলের pH পরিবর্তনে বাধাদানকারী বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যকে বাফার বলে।

অরনিথিন চক্র : দেহে অব্যবহৃত অ্যামিনো এসিড বিশ্লিষ্ট হয়ে যে অ্যামোনিয়া তৈরি করে তা বিষাক্ত। অ্যামোনিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে মিলিত হয়ে যকৃতে অরনিথিন চক্রের মাধ্যমে কম ক্ষতিকারক পানিতে দ্রবণীয় ইউরিয়ায় পরিণত হয়। ইউরিয়া প্লাজমায় অবস্থান করে এবং সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে বৃক্কে পৌঁছে।